শব্দের নৈবেদ্য

এ.এন.এম. নূরুল হক

ঐতিহ্য

কবিতার আড়ালে লুকানো কথা

কবিতার সাথেই আমার প্রথম প্রেম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' কবিতাটি কৈশোরে আমার প্রাণে এমন ঝংকার তুলেছিল যে তার রেশ আজও কাটেনি। শৈশব ও কৈশোরের গণ্ডি ছড়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম তারুণ্যে তরঙ্গিত প্রাণ সহজেই পা বাড়ায় কবিতার পরিপ্লুত ভালোবাসার জগতের দিকে। তখন কবিতা হয়ে যায় নারী আর নারী কবিতা। কলেজ বার্ষিকীতে কয়েকটা কবিতা ছাপা হলেও কবিতা তখনো আমার কাছে অধরা মাধুরী। আমিও নাছোড়বান্দা, কিছুতেই কবিতার পিছু ছাড়ার নয়। আমি তখন কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের ছাত্র। সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে তৎকালীন মহকুমা শহর কিশোরগঞ্জ অনেক জেলা শহর থেকেও অগ্রসর ছিল। বিভিন্ন সংগঠন থেকে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এসব সাহিত্যপত্রেও আমার কিছু কবিতা ছাপা হয়েছিল, যা ভেসে গেছে কালের প্রবাহে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরপরই কবিতার সঙ্গে আমার যেনো ঘর-গৃহস্থালি শুরু হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, শার্ল বোদলেয়ার আর গারসিয়া লোরকা—এই কবি চতুষ্টয়ের কবিতার নিস্যন্দে তখন তৈরি হয়েছিল আমার কাব্যিক মন ও মননের পাটাতন। সেই দিনগুলোতে অবলীলায় অবগাহন করেছি শেকসপিয়র-কিটস-শেলি-বায়রনের অতল কাব্য সরোবরে। কয়েকজন উদীয়মান তরুণ কবির সাথেও যেচে বন্ধুত্ব করি। তাদের উৎসাহে পুরোদমে চলতে থাকে কাব্যচর্চা। কিন্তু এই কবি বন্ধুদের সাথে চলতে গিয়ে একটা জায়গায় বড় হোঁচট খাই। সেসময় হাইকোর্টের মাজারে নূরা পাগলা নামে এক ভন্ড সাধুর আবির্ভাব ঘটেছিল। সন্ধ্যার পর সেখানে গান আর গাঁজা সেবনের জমজমাট আসর বসত। আমার কবি বন্ধুদের সেখানে ছিল নিয়মিত যাতায়াত। তাদের ভাষ্য, গাঁজায় দম না দিলে কবিতা ধরা দেয় না। গঞ্জিকাসেবী এই কবি-বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একদিন আমিও নূরা পাগলার

আস্তানায় হাজির হই। কিন্তু আমি একঘণ্টাও সেখানে টিকতে না পেরে পালিয়ে আসি। এর পর থেকে আমি গঞ্জিকাসেবী কবি বন্ধুদের এড়িয়ে চলা শুরু করি। ফলে আমার কাব্যচর্চায় ভাটার টান পড়ে।

এরই মধ্যে মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে মা-বাবার মৃত্যু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আমার মাথায় নেমে এলো। হাই স্কুলের শিক্ষক বাবার বেতনের টাকাতেই চলতো আমার লেখাপড়ার খরচ। সংসারের দায়িত্বপ্রাপ্ত বড় ভাই জানিয়ে দিলেন, বাড়ি থেকে আমার লেখাপড়ার খরচ দেওয়া সম্ভব নয়। আমি তখন অকূল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। একজন পরম হিতৈষীর চেষ্টায় রেডিও বাংলাদেশে খণ্ডকালীন নিউজ মনিটরের চাকরি পেয়ে যাই। দৈনিক পারিশ্রমিক দশ টাকা। তখনকার দিনে এই ছিল আমার জন্য যথেষ্ট। একদিন শেষ হয় এই দুঃখের কালো অধ্যায়। তবে রয়ে যায় কষ্টের মোড়কে হৃদয়ের ঋণ। অভিমানী প্রেয়সী কবিতা আমাকে ছেড়ে চলে যায়। তাই গদ্যের জগতে বিচরণ। ভিখিরির মতো হাত পেতেছি কবিতার কাছে। তারপরও দীর্ঘকাল ধরে কবিতার সাথে চলতে থাকে প্রেম-বিরহের এক্কা-দোক্কা খেলা। বিক্ষত ডানায় উড়ন্ত পাখির মতো আবেগের তাড়নায় তবু লেখা হয় দু-একটা কবিতা। একটা দীর্ঘ সময় পার করে কবিতা আমার কাছে ফিরে আসে। তারপরও কবিতাই আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী স্থান করে নেওয়া এক নৈসর্গিক সত্তা, সুন্দরের অভ্যর্থনা। আসলে কবিতা এক আশ্চর্য প্রেমিকা! কখনো নিজেই এসে ধরা দেয়, আবার কখনো দিনরাত পিছু ছুটেও ধরা যায় না।

কথাকিঞ্চিৎ

চারপাশের হাহাকার আর অশান্তিতে মনের ভেতরটা যখন অনিমেষে কেঁদে ওঠে, তখন একটু স্বস্তির খোঁজে মন মরিয়া হয়ে ওঠে। মনের এই স্বস্তির জায়গাটি হলো কবিতার পরিমণ্ডল। শব্দের গাঁথুনিতে তখন মনের যাতনা, মনের ভাবনা প্ররূঢ় হয় কবিতার অবয়বে। এমনই কিছু নানামুখী যাতনা আর বহুমুখী ভাবনার যুগলবন্দি এই বইয়ের কবিতাগুলো। কখনো বেদনার শিহরনে অন্তঃক্ষরণ আবার কখনো অমল আনন্দে ভেসে যাওয়া চরাচরে কথার কলতান। প্রত্যেক কবির একটা গোপন বৈচিত্র্যময় জগৎ থাকে। যেখানে লুকিয়ে থাকে এক নিস্যন্দ চেতনা, যা দুঃখকে আপন করতে শেখায়, আনন্দকে ছুঁয়ে থাকতে শেখায়। এভাবেই কবিতার সাথে আমার তৈরি হয় হৃদয়ের নিবিড় বন্ধন।

আধুনিকতার নামে অহেতুক দুর্বোধ্যতা আর নির্লজ্জ যৌনতার জন্য কবিতা হারাতে চলেছে শাশ্বত মহিমা আর আলোঝলমলে মুগ্ধতা। ভাব আর ভাষার দুর্বোধ্যতা কবিতাকে ক্রমাগত সাধারণ পাঠকের আগ্রহের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। অনেক কবিতা এখন আর আগের মতো অন্তরে হিল্লোল তুলে না, যেমন তুলতো যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কাজলা দিদি' কিংবা জসিমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা। কবিতার পাঠক তো চায়, সুখে-দুঃখে কবিতা হৃদয় ছুঁয়ে থাক। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা কতোটা পূরণ হচ্ছে? কে নিবেন এর দায়ভার, স্বয়ং কবি, বলিরপাঁঠা পাঠক নাকি অভীলাষিত সময়?

কাব্যসাগর মন্থন করে কবিতার সঞ্জীবনী সুধা তুলে এনে ভিজিয়ে দেব পাঠক-হৃদয়, এমন অমোঘ উচ্চারণের দুঃসাহস আমার নেই। বরং কাব্যজগতের সুবিশাল পরিমণ্ডলে আমার এই আকিঞ্চন তৃষ্ণাতুর চৈত্রে দুফোঁটা বর্ষণ মাত্র। 'শব্দের নৈবেদ্য' বইটিতে সন্নিবেশিত কবিতাগুলো সহজ ও অনায়াসলব্ধ প্রয়াস। অভিধান থেকে দূরূহ শব্দ সংগ্রহ করে নয়, বরং ক্লান্তিহীন মননের এক বেগবান স্রোতধারায় স্নাত হয়ে রচিত। কবিতাগুলোর কথায় যেমন নেই দুর্বোধ্যতা তেমনি ভাবেও নেই গুরুগম্ভীর অস্পষ্টতা।

কবিতাকে কল্পনাবিলাসের সূউচ্চ চূড়া থেকে বাস্তব জীবনের পাটাতনে নামিয়ে আনার চেষ্টা রয়েছে এই বইটিতে। কবিতার সাথে বিরহ-বিচ্ছেদ শুরুর পরও কখনো অতর্কিতভাবে কবিতা এসে হানা দিত মনে। প্রায় এক দশক ধরে এভাবেই রচিত এই কবিতাগুলো কোনোটা ছাপা হয়েছিল দৈনিকের সাহিত্য পাতায়, কোনোটি সাহিত্য সাময়িকীতে। সংরক্ষণের অবহেলায় বেশ কিছু কবিতা চিরতরে হারিয়ে গেছে কালের অনন্ত প্রবাহে। যেগুলো উদ্ধার করা গেছে, সেগুলো ঘষা-মাজা করেই সাজানো হয়েছে 'শব্দের নৈবেদ্য', যাকে বলা চলে অবেলার অবগাহন। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত চারটি কবিতা সন্নিবন্ধ হয়েছে বইটিতে, যা প্রকৃত অর্থে কবিতার শব্দমালায় হৃদয়ের মথিত রোদন।

এই বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ কবিতা এবং এক ঝাঁক জোনাকির মতো জ্বলজ্বলে ২০টি ছেঁড়াখোঁড়া কবিতা, যাতে রয়েছে শব্দের ঝংকারে অপার মুগ্ধতার ছড়াছড়ি। বৈচিত্র্যময় বিস্ময়ে ভরা 'শব্দের নৈবেদ্য'-র অন্দরমহল। এই অন্দরমহল কবিতাপ্রেমীদের অবাধ বিচরণভূমি হয়ে উঠবে এটিই আমার প্রতীতি।

সূচি

অমূল্য পরিচিতি ১৩
প্রিয়াক্ষী ১৫
নৈসর্গি ১৭
ধর্ষিতার রক্তাক্ত পেটিকোট ১৮
অনাগত কন্যাশিশুর প্রতি ২০
বিপ্লুত বিকার ২২
নীল খামের চিঠি ২৩
স্বপ্ন ভিক্ষে ২৪
ঠিকানার খোঁজে ২৫
কোথায় রাখবো এতো লাশ ২৬
বিস্ময়কর বিজয় ২৭
হারিয়ে গেছি আমি ২৮
নতুন বাংলাদেশ ২৯
মৃত্যুর অভিলাষ ৩০
হেলেন তুমিই ৩১
অনন্যা ৩২
কবিতার খোঁজে ৩৩
মুগ্ধতা ৩৫
দিনান্তের দিনলিপি ৩৬
কবির কাছে খোলা চিঠি ৩৮
নিস্যন্দী অন্তর ৪০
গোপন মন্ত্র ৪১
মাতৃদিবস ৪৩
৪৪ পারমিতার পুতুল
৪৫ আগুন
৪৬ স্বাধীনতার নাম
৪৮ অচিন পাখি
৪৯ ফাগুন রাঙা মেয়ে
৫০ অসাধারণ একজন
৫২ অপরূপ বাঁচা
৫৩ বন্ধুত্বের সহস্র বছর
৫৪ পাগল
৫৫ মৌ
৫৬ হনুমানের আত্মদর্শন
৫৭ শৃঙ্খলিত জীবন
৫৮ গিরগিটির আত্মহত্যা
৫৯ ফিলিস্তিনের শিরিন
৬০ কে তুমি
৬১ সুখ
৬২ বৈশাখ
৬৩ শুভংকরের ফাঁকি
৬৫ কাঠগড়ায় ভালোবাসা
৬৭ অয়োময় ব্যূহ
৬৮ সোমা আমার বোন
৬৯ ফিলিস্তিনের জ্বলজ্জ্যোতি শিশু
৭০ ভুলের জীবন

ছেঁড়াখোঁড়া পঙ্‌ক্তিমালা ৭২

অমূল্য পরিচিতি

মানুষটা ছিলেন একজন কবি
চিনতো না কেউই তাকে এই পরিচয়ে,
ছন্নছাড়া একজন মানুষ ছাড়া
আর কোনো পরিচিতি তৈরি হয়নি জীবনে।

রক্ত আখরে লেখা কবিতা তার
স্থান পেতো মলিন এক খসড়া খাতায়,
ডাস্টবিনে খাদ্য অন্বেষী অনাথ শিশু
আর পথের বেওয়ারিশ কুকুর
ওদের সাথেই সখ্য ছিল তার
ওরাই প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল কবিতার।

মাথায় উশকোখুশকো সাদা কালো চুল
বেশভূষায় দৈন্যতার সকরুণ ছাপ,
জোড়াতালি দেওয়া স্যান্ডেল পায়ে
যাচ্ছিলেন হেঁটে রাজপথের প্রান্ত ঘেঁষে।

একটা বেপরোয়া গাড়ি
রাজপথের গর্বিত বাহন
সজোরে আঘাত করে কবিকে
ছুটে গেলো দুর্বার গতিতে,
রক্তস্রোতে মাখানো নিষ্প্রাণ দেহটা
সারারাত রাজপথে রইলো পড়ে।

পুলিশ তদন্তে এলো পরদিন সকালে
শরীর তল্লাশি শেষে পাওয়া গেলো
রক্তে ভেজা একটা চিরকুট, তাতে ছিল লেখা
এই পৃথিবীতে আমার একজনই আপন
আমার প্রিয়তমা, সে আমার কবিতা
আমার মৃত্যু তার চুম্বনে মাখা।

আঞ্জুমানের লাশবাহী গাড়ি এসে
তুলে নিয়ে গেলো লাশটা
মৃত্যুর মূল্যে মানুষটার অবশেষে পরিচিতি মিললো
অমূল্য এক পরিচিতি—
বেওয়ারিশ লাশ ।

প্রিয়াক্ষী

প্রিয়াক্ষী নামটি বাবার দেওয়া
সোহাগী হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষক,
প্রথম সন্তান, আঁতুড়ঘর থেকে মিহি কান্নার শব্দ
বাঁশির সুরের মূর্ছনায় ভেসে আসে কানে
সন্তানের মুখটা একনজর দেখার উত্তেজনা
ছাড়িয়ে যায় সীমাবদ্ধতার সীমা অতিক্রম করে।

সদ্যোজাত কন্যার মুখের দিকে তাকাতেই
দৃষ্টি কাড়ে মণিবর্ণা ছোট্ট দুটো চোখ
কাজল আঁকা চোখ নিয়েই আগমন তার পৃথিবীতে
প্রিয় আঁখির কন্যার নাম রাখলেন প্রিয়াক্ষী।

আদর্শ শিক্ষক বাবার সবগুণই তার করায়ত্তে
কৃষ্ণের মতো বাবার গায়ের রংটিও পেয়েছে জন্মসূত্রে।
স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি সর্বদাই দখলে তার
বিতর্কে সেরা সে, আবৃত্তিতেও অদ্বিতীয়া
প্রিয়াক্ষী নামটি নিয়েই তার যতো বিপত্তি
কেউ ডাকে কৃষ্ণকলি, কেউ বা মা-কালি।

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েও অপরিবর্তিত পরিস্থিতি
প্রিন্সেস অব উগান্ডা, অনেকেই ডাকে পরিহাসে
অচেনা একটা ছেলে পাশাপাশি হেঁটে যেতে
ব্ল্যাক বিউটি ডেকে ছিল হয়তো মনের ভুলে।
প্রিয়াক্ষী এখন একটা কলেজে বাংলার শিক্ষক
পড়ায় মন-প্রাণ ঢেলে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ
বৈষ্ণব কাব্যে রাধিকার রূপের মাধুর্য
বর্ণনা করে সে মনের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে।

চল্লিশটি বসন্ত পেরিয়ে গেছে দোলা দিয়ে মনে
কোকিল কখনো ডাকেনি, বসেনি গাছের ডালে

এসব নিয়ে তার নেই কোনো মনোবেদনা
সে জানে, কোথায় তার অকরুণ প্রতিবন্ধকতা।

কেবল ক্লান্ত দিনের অলস ক্ষণে
বাবার কথা পড়লে মনে
চোখজোড়া সে মেলে ধরে বন্ধ ঘরে আয়নাতে
নিষ্পলক তাকিয়ে খুঁজে
বাবার প্রিয় আঁখির প্রিয়াক্ষীকে।

নৈসর্গি

সারঙ্গ হরিণীর মতো চঞ্চলা এক তরুণী
শিমুল ফুলের রং মাখা দুর্দান্ত সুন্দরী
প্রকৃতির তনয়া সে, নাম নৈসর্গি
সযতনে স্নিগ্ধতায় তাকে সাজায় জননী,
শঙ্খের সংকোচিত খোলস ছেড়ে
নৈসর্গি বেড়ায় ঘুরে সান্দ্র বনানীজুড়ে।

জননী প্রকৃতির অমোঘ আহ্বানে
স্বপ্ন বুনে চলে সে নিকুঞ্জ বনে
প্রকৃতি দিয়েছে তাকে মুক্তির মন্ত্রণা
আনন্দ ঢেলে দিয়েছে মুছে অব্যক্ত যন্ত্রণা।
রাজছত্র বিস্মৃত সুবিশাল অঙ্গণে
পৃথিবীর সব সুখ লুটায় তার চরণে
হৃদয়ের সবটুকু আনন্দ ঢেলে
শরীরের ভাঁজে ভাঁজে উচ্ছলিত ঢেউ তুলে
মগ্ন অনুরাগে গহিন কাননে
নৈসর্গি নাচে মুক্তির কল্লোলে।